বৈদিক সুর্য বন্দনার বিজ্ঞান

ডঃ সব্যসাচী সরকার
অবৈতনিক অধ্যাপক,আই আই ই এস টী-শিবপুর ও ভুতপূর্ব অধ্যাপক,আই আই টী- কানপুর

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম । ধান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ।

উপরে লেখা মন্ত্রটা আমরা সবাই জানি আর বাংলায় প্রায় এর মানেটা হচ্ছেঃ
ওম্, পুষ্প গুচ্ছের ন্যায় নানা রংএ উদভাষিত, সব অন্ধকার, পাপ ও অজ্ঞতার বিনাশকারী আর জীবনদায়ী দিনের আলোর স্রষ্টা, ঋষি কাশ্যপপুত্র দিবাকরকে প্রনাম করি।
আমাদের বৈদিক রীতি অনুযায়ী সকালে নদীতে আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে স্নানের সময় পূর্ব দিশায় মুখ করে সূর্যবন্দনার এই মন্ত্র পড়ার বিধান আছে। আজকের সভ্যতায় এসব মন্ত্রপাঠের বিধি সকল সব বেকার মনে হয় যা পুরোনো লোকেরাই মেনে চলে, " বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" আপ্ত বাক্যে ভরষা করে। তবে সত্যই কি এসবের কিছু প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে।এগুলি সবই কি ধর্মীয় আচরন না এর মধ্যে সুপ্ত ভাবে বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে - সেই নিয়েই এই লেখা। দু লাইনের মন্ত্রটির বেশীর ভাগ অংশই সোজা সুর্যের রূপ ও বংশ পরিচয় ও তার স্তুতির বর্ননা যা সহঝেই বোঝা যায় তবে মধ্যের "পাপ ও অজ্ঞতার বিনাশকারী আর জীবন দায়ী" এই অংশটি সূর্যের দৃশ্যত কোন গুনের ব্যাখ্যা তা আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যায়না – মনেহয় বৈদিক ভগবান সূর্য, একমাত্র যাকেই প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করা যায়, তাকে তুষ্ট করতে এসব আলংকারিক শব্দাবলীর ব্যবহার হয়ে এসেছে । প্রশ্নটা এখন, সত্যই কি এগুলি চাটুকারিতার শব্দ গুচ্ছ - না এই গুণগুলি সূর্যের অন্তরনিহিত আর সেগুলি একেবারে বিজ্ঞান ভিত্তিক ।যদি সবটাই বিজ্ঞান ভিত্তিক তবে মন্ত্রোউচ্চারনের প্রয়োজনটা কি ? আপামর সাধারন মানুষ প্রতিদিন বিজ্ঞান প্রদত্ব স্বাস্থের বিধি নিষেধ মেনে চলেন না এটা বৈদিক যুগের বিজ্ঞান তপস্বীরাও বুঝতে পেরেছিলেন তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে ধার্মিক রীতিনিতির মোড়কে ঢেকে তা ধর্মীয় আচারের অঙ্গ হিসেবে পরিবেষন করে গিয়েছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সঠিক পালন না করলে ভগবানের কোপে পড়তে হবে ভেবে ধর্মভীরু ভারতীয়রা সেগুলির ব্যতিক্রম খুবই কম মাত্রায় করে থাকে – অবশ্য বিশেষ ব্যতিক্রমের জন্য আতুরে নিয়মঃ নাস্তি নামক আপ্ত বাক্য মেনে চলার বিধান আছে তাই অসুস্থ ব্যক্তি বিশেষে এ নিয়মের শিথিলতা পালিত হয়ে থাকে।এবার দেখা যাক এই বৈদিক মন্ত্রোউচ্চারনের বিজ্ঞান ভিত্তিটা কতটা মজবুত।
আমাদের শরীরের সুস্থতার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন ও অতি অল্প পরিমাপে খনিজ লবনসমষ্টির প্রয়োজন থাকে আর এগুলোর কোনো একটার কম হলে শরীরে না না রোগের আক্রমন হয়ে থাকে।এবারে একেবারে এক নতুন গবেষনার কথা দিয়ে এই বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনাটা শুরু করি- বিলেত দেশে দেখা গেছে যে গ্রীষ্মকালের পরই যেসব শিশুরা জন্ম গ্রহন করে তাদের হাড় শীতে জন্মানো শিশুদের থেকে বেশী পুরুষ্ট ও শক্ত ।এখানে বলে রাখি যে রিকেটী

মার্কা হাড় জনিত ব্যারাম আমাদের ঘরে ঘরে । বয়সের সঙ্গে অষ্টোপোরেসিস নামক হাড়ের ব্যাধি যা আবার বাত জনিত রোগের সঙ্গে মিশে আমাদের জীবনকে খুবই যন্ত্রনাদায়ক করে তোলে। বিলেতে সূর্য অল্প বিস্তর গ্রীষ্মকালেই প্রকাশিত বাকি সময় বৃষ্টি,মেঘ ও কুয়াশা দিয়েই ঢাকা থাকে।এবারে সুর্য মন্ত্রের সঙ্গে এগুলির সম্বন্ধ কি ? সেটা হলো ভিটামিন ডি , যা হাড়কে বলিষ্ট ও পুরুষ্ট করতে কাজে লাগে-এই ভিটামিন মাছের তেলে ,ডিমে ও এরকম কিছু খাবারে আমরা পেয়ে থাকি কিন্তু প্রত্যহ শরীরের যা প্রয়োজন তা এ ভাবে পুরণ হয়না।আবার আমাদের রান্না করার বিধিতে এর অনেক ভাগই নষ্ট হয়ে যায়।তবে রোজকার শরীরের উপযোগী পরিমান ভিটামিন ডি সূর্যের আলো শরীরের চামড়ার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করে অন্য রসায়ন যা আমরা খাবারের সঙ্গে গ্রহনকরি সেগুলিকে ভিটামন ডি তে সহজেই রুপান্তরিত করে আমাদের সুস্থ সবল থাকতে সাহায্য করে থাকে।এ ছাড়া এই সূর্যের আলো বিশেষ কয়েক ধরনের শরীরের ক্যান্সার রোগটির প্রতিরোধক ও রোগ হলে তা কমাতে সাহায্য করে থাকে।হার্ট অ্যাটাকের বিরুদ্ধে এই আলো প্রথম থেকেই কাজ করে থাকে।শুধু তাই নয় ডায়াবেটিস ও টিউবারকুলোসিস রোগগুলির এই আলো প্রতিসেধক হিসেবে কাজ করে। আমার মনে হয় যে মন্ত্রের "জীবন দায়ী" শব্দদুটির মানে বুঝতে এখন আর অসুবিধার কোনো কারণ দেখতে পাই না।এবারে বাকী শব্দ সমষ্টীর মানে বোঝার চেষ্টা করি- মানে , "পাপ ও অজ্ঞতার বিনাশকারী " এ বিষয়ে সূর্য বন্দনার সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাক্ষা কি? এই শব্দ গুলি আমাদের বৌদ্ধিক জ্ঞানের উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত। ভালো মন্দের তফাৎ ,সামাজিক দায়িত্বগুলোকে সঠিক বুঝে সেরকম আচরণ বিধি মেনে চলার যে বুদ্ধির বিকাশের প্রয়োজন তা বৈজ্ঞানিক মতে আমাদের ব্রেন দ্বারা পরিচালিত হয়। এর সঙ্গে মানসিক অবসাদ যুক্ত শহরে বসবাস করা মানুষদের হতাশাও ঐ ব্রেন দ্বারা পরিচালিত।এবারে সুর্য কিরণ আমাদের নিউরন জাতীয় উপশিরা বাহিত ভাবনাচিন্তার প্রকৃত সন্চালনে সাহায্য করার রসায়নগুলিকে সুস্থভাবে তৈরী করতে সাহায্য করে থাকে।পাপ কথাটি অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত তাই উন্নত ব্রেন মানুষের প্রাজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে। কাজেই বৈদিক সুর্য বন্দনার অন্তরনিহিত বৈজ্ঞানিক ব্যাক্ষা এভাবে পরিষ্কার বোঝা যায়।।

এবারে কিছু বিধি নিষেধ। শরীরে তেল মেখে নদীতে আবক্ষ জলের তলায় দাঁড়িয়ে প্রাতকালে পুব দিশায় সুর্যকে বন্দনা করার বিধি।এই মন্ত্র কয়েক বার পড়বার নিয়ম আছে যেমন ধরা যেতে পারে ১০৮ বার। এই ১০৮ সংখাটি বিশেষ কিছু মানে রাখে না শুধু এই সুর্য স্নানকে কয়েক মিনিটের সময়ে বেঁধে রাখে।১০-১৫ মিনিট ঐ ভাবে পুর্ব দিশায় মুখ করে জলে দাঁড়িয়ে থাকলে শরীরের উপরের ভাগ বেশ কিছুক্ষণ সুর্য প্রকাশ পেয়ে দিনের পর্য্যাপ্ত পরিমান ভিটামিন ডি তৈরী করে আর শরীরের নীচের অংশ জলের তলায় জলের ন্যাচুরোপ্যাথীতে শরীরের আভ্যন্তরিক তাপের প্রশমন করে শরীরকে শীতল করতে সাহায্য করে।এভাবে শরীরের প্রতিদিনের ভিটামিন ডি সুর্য কিরনে আমরা পেয়ে থাকি তাই প্রতিদিন সুর্য বন্দনা করার ধার্মিক বিধান । বিজ্ঞানের বেশী কচকচির মধ্যে গিয়ে লেখাটিকে ক্লিষ্ট করতে আমি ইচ্ছুক নই । এখানে আমি অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষনার মুল উপলব্ধির সারাংশ সাধারন ভাষায় উস্থাপিত করেছি। না না দেশে না না তেজের সুর্য রশ্মি বছরের ১২ মাসে বিভিন্ন মাপের বিকিরন করে আবার সাদা চামড়ার মানুষদের কিরনের শোষণ ক্ষমতা আমাদের গায়ের রংএর শোষণ ক্ষমতার সঙ্গে তফাৎ আছে।প্রচুর সুর্যের আলোর লোভে অনেক বিদেশী ট্যুরিষ্ট গায়ে ক্রীম লাগিয়ে ভারতের মত সুর্য প্রধান দেশে এসে কাঁচা ফলের আচার হবার পদ্ধতিতে সুর্য স্নান করে। এটা অনেকটা বাড়ীর শিশুকে তেলমালিশ করে উঠোনের রৌদ্রে শুইয়ে রাখার মতন।মা ঠাকুমারা জানেন যে শরীর পুষ্ট ও শক্ত করতে এই প্রথার

কোনো বিকল্প নেই।আবার পুরোদিন সুর্য কিরণ হিতে বিপরীত হতে পারে তার কারন যে অতি বেগুনীরশ্মী সমষ্টী সুর্য বিকীরণে বেশী পরিমানে শরীরে শোষিত হলে ত্বকের ক্যান্সার হতে সাহায্য করে। সূর্য বন্দনায় ১০৮ বার মন্ত্র পাঠের সময়ের নির্দিষ্ট পরিমাপ এই বাড়তি সুর্য বিকীরণের প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা করে। সেইজন্য ক্রিকেট মাঠের খেলোয়াড়রা মুখে ভুতের মত ক্রীম মেখে ফিল্ডিং করে থাকে।জল,কাঁচ,জামাকাপড় ও ক্রীম জাতীয় জিনিষ গুলি অতি বেগুনীরশ্মী গুলিকে শোষিত করে ত্বকে পৌছতে বাধার সৃষ্টি করে তাই বাড়ীর কাঁচের জানলা ভেদ করে আসা সুর্যের আলোয় এই প্রয়োজনীয় অতি বেগুনীরশ্মী গুলি থাকেনা।আজকের সভ্যতার শহরের এ্যাপার্টমেন্টে থাকার সবথেকে বড় অসুবিধা সুর্যকিরনের অভাব।এক চিলতে রোদ জানলা দিয়ে ভীতরে প্রবেশ করলেও তা ক্ষনিকের অতিথি আর বারো মাসে তা পৃথিবীর সুর্যমুখী দিক পরিবর্তনে অনেক মাসই অদৃশ্য থেকে থাকে। এই সুর্য কিরণের অভাবে আমাদের ব্রেনের নিউরন নেট ওয়ার্কএর উপর প্রভাব পড়ে। এরকম ব্যবস্থায় প্রতিদিন অতিবাহিত হলে মানসিক আবসাদগ্রস্থ লোকজনের সংখা বাড়ে।এরা তুচ্ছ কারনে অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া করে আর সবথেকে বড় অপরাধ যাকে আমরা আত্মহত্যা বা সুইসাইড বলি সেটা করতে দ্বিধা করে না। বর্ষাকালে ক্রমাগত সাতদিন মেঘে ঢাকা আকাশ থাকলে সুস্থ মানুষদেরও মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আর তার পরে প্রথম সুর্যের আলো মনকে অনেক প্রসন্নতায় ভরিয়ে দেয় আর মনে করিয়ে দেয় এই নীল গ্রহের মানুষদের সঙ্গে সুর্যের আত্মিক সম্পর্ক । সুর্য প্রকাশিত না হলে আমরা সহ পুরো পৃথিবী মৃত।